সনাতন ধর্ম শিক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“সর্ব অবস্থায় মনকে যিনি স্থির রাখতে পারেন তিনিই যোগী।”

–শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

“যত-মঠ মন্দির তীর্থস্থান সবখানে একই ভগবান।”

-স্বামী বিবেকানন্দ

“সত্যই হলো ভগবান, সত্য সাধনাই হলো তপস্যা, সত্যের চেয়ে বড় আর কিছু নাই।”

-ব্যাসদেব

“যে অল্পেতে তুষ্ট থাকে তার কাছে এ পৃথিবীর সব কষ্ট সহজ হয়ে যায়”

-মা সারদা দেবী

“নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই যথার্থ সৌন্দর্য।”

-স্বামী স্বরূপানন্দ

সনাতন ধর্ম শিক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য

সম্পাদনা

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
শীর্ষক প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি

দেবেন্দ্র নাথ উরাঁও
এ, এম, জহিরুল হায়াত
নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
তাপস কুমার আচার্য্য
মোঃ নুরুজ্জামান
মোঃ মনির হোসেন মজুমদার
নিবাস চন্দ্র মাঝি
অসীম চৌধুরী
কাকলী রানী মজুমদার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সনাতন ধর্ম শিক্ষা

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য

সম্পাদনায়	:	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি
স্বত্ব	:	প্রকল্প কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়	:	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ সংখ্যা	:	১,৫৫,৫০০ কপি
প্রথম প্রকাশকাল	:	আষাঢ় ১৪১০ বঙ্গাব্দ/জুন ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ
বাইশতম প্রকাশকাল	:	অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
মুদ্রণ ও বাঁধাই	:	প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স ৭৬/ই, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

মুখবন্ধ

নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত হয়ে মানবতাবোধ ও মানবকল্যাণে প্রয়াসী হবার লক্ষ্য নিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প। সমগ্র বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ০৪-০৬ বছর বয়সী শিশু শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা প্রসারে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ৫,০০০টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে সনাতন ধর্মের মৌলিক ধারণাগুলো শিক্ষা দেওয়া এবং পৃথিবীর সকল ধর্মের তথা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণু মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় 'সনাতন ধর্ম শিক্ষা' নামক পাঠ্যবইটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

'সনাতন ধর্ম শিক্ষা' বইটিতে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের উপযোগিতা বিবেচনায় রেখে শিশুর কৌতুহলী মনের জিজ্ঞাসাকে নিবারণের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির নতুন সংস্করণে সনাতন ধর্মের সৃষ্টির রহস্য, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, প্রণামমন্ত্রের সাথে সরলার্থ যুক্ত করা হয়েছে। 'সনাতন ধর্ম শিক্ষা' বইটি প্রণয়নে কারিকুলাম কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও বইটির সম্পাদনা, প্রচ্ছদ নির্বাচনসহ মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বইটি মুদ্রণে অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা পরবর্তীতে সংশোধনের প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে 'সনাতন ধর্ম শিক্ষা' বইটি পাঠে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকসহ পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হবেন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।

সূচিপত্র

পাঠক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
পাঠ–১	সৃষ্টিকর্তা	১–২
পাঠ–২	প্রার্থনা	৩–৬
পাঠ–৩	আচরণ	৭–১০
পাঠ–৪	নিত্যকর্ম	১১–১২
পাঠ–৫	সত্য ও মিথ্যা	১৩–১৫
পাঠ–৬	দেব ও দেবী	১৬–২৭
পাঠ–৭	মন্দির ও তীর্থস্থান	২৮–৩১
পাঠ–৮	অবতার ও মহাপুরুষ	৩২–৪১
পাঠ–৯	স্বর্গ ও নরক	৪২–৪৩
পাঠ–১০	ধর্মগ্রন্থ	৪৪–৬০

পাঠ - ১

ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা কে?

শিক্ষক ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন এই যে, সূর্য, নদী, গাছপালা, ঘরবাড়ি, জীবজন্তু, আকাশবাতাস, মানুষ দেখতে পাচ্ছো

- এগুলো কোথা থেকে এলো?
- নিশ্চয় কেউ না কেউ সৃষ্টি করেছেন?
- যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কে?

তিনিই স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা।

সৃষ্টিকর্তাকে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু একই নামে ডাকে না। ডাকে বিভিন্ন নামে। যেমন–হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈশ্বর বা ভগবান বলে ডাকেন। আর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা গড বা ঈশ্বর বলে ডাকেন। আর মুসলমানেরা সৃষ্টিকর্তাকে বলেন আল্লাহ্।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা যেভাবেই ডাকুক না কেন, সবাই কিন্তু ঐ একজনকেই ডাকেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সৃষ্টিকর্তা একজন কিন্তু এতো নাম হলো কী করে? এক্ষেত্রে ছোট্ট একটা গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা–

বিমল, (ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যস্থিত কারো নাম)

তুমি তোমার বাবাকে কী বলে ডাকো?

–বাবা।

তোমার কাকা তোমার বাবাকে কী বলে ডাকেন?

–দাদা।

তোমার ঠাকুরদা/ঠাকুরমা তোমার বাবাকে কী বলে ডাকেন?

–খোকা।

এভাবে তোমার পাড়া–প্রতিবেশী বিভিন্নজনে বিভিন্ন নামে তোমার বাবাকে ডাকেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা ডাকেন কয়জনকে? একজনকে অর্থাৎ তোমার বাবাকেই। তাই না? তাহলে বুঝতে পারলে, ব্যক্তি একজন হলেও তাঁর নাম বিভিন্ন হতে পারে।

সেরূপ ঈশ্বর এক হলেও তাঁর বহু নাম।

বলো তো দেখি :

১। ঈশ্বর কে?

২। ঈশ্বর কয়জন?

৩। ঈশ্বরের কয়টি নাম?

পাঠ – ২

প্রার্থনা

প্রার্থনা কী ?

আমরা ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানলাম। আসলে তিনিই সবকিছু দেখাশোনা করে থাকেন। আমাদের সকল কাজ বা ভালো ও মন্দ, তিনিই ঠিক করে দেন।

তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি। তিনি খুশি হলেই তবে আমরা তাঁর করুণা লাভ করতে পারি।

ঈশ্বরকে খুশি করতে হলে তাঁকে ভক্তি করবো, প্রতিদিন তাঁর নাম স্মরণ করবো। এভাবে ঈশ্বরের কাছে মনের কথা বলাই হচ্ছে উপাসনা বা প্রার্থনা।

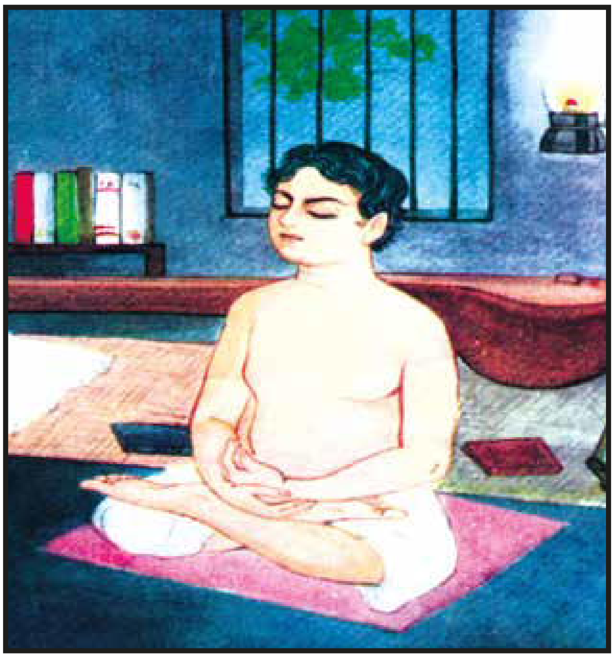

প্রার্থনারত বালক বিবেকানন্দ

প্রার্থনা কখন করতে হয়?

সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যা এই তিন বেলা প্রার্থনা করতে হয়। অবশ্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সবসময় সব জায়গায় করা যায়।

এসো, আমরা সূর্যের কাছে প্রার্থনা করি,

সূর্যকে প্রণাম জানাই :

"ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥"

অনুবাদ : জবা ফুলের মতো রং কশ্যপের পুত্র, আলোকময়, অন্ধকার দূরকারী সমস্ত পাপ বিনাশক সূর্যকে প্রণাম করি।

গায়ত্রী মন্ত্র : **'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ**
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ (ঋগ্‌বেদ-৩/৬২/১০)।

অনুবাদ : যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণস্বরূপ, যিনি সচ্চিদানন্দ এবং আমাদের বুদ্ধির প্রেরণাদাতা, সেই সদালীলাময় জগৎ স্রষ্টা পরমেশ্বরের বরণীয় জ্যোতির্ময় তেজকে বা রূপকে আমরা ধ্যান করছি। আমরা প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বদা জগতের কল্যাণময় কাজে নিয়োজিত করেন।

কী প্রার্থনা করবো?

প্রার্থনা কী করবো, এটা নির্ভর করে যে প্রার্থনা করবে তার প্রয়োজনের ওপর। অর্থাৎ আমি কী পেলে খুশি হবো, তা আমিই ভালো জানি। আমার মনের কথাই আমি ঈশ্বরের কাছে জানাবো। তবে সবসময়ই ভালো কিছুর প্রার্থনা করতে হয়।

এসো, প্রার্থনা করি :

'অসৎ হইতে মোরে সৎ পথে নাও,
জ্ঞানের আলোক জ্বেলে আঁধার ঘোঁচাও।
মরণের ভয় যাক অমর করো,
দেখা দিয়ে ভগবান শংকা হরো।
করুণা আশিস ঢালো রুদ্র শিরে,
চিরদিন থাকো মোর জীবন ঘিরে।
ঝরিয়া পড়ুক শান্তি চরাচরময়,
চিরশান্তি পরিমলে ভরুক হৃদয়।'

এখানে মনে রাখতে হবে, আমাদের ধর্মে বহু দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয় এবং প্রার্থনাগুলি সংস্কৃত ভাষার শ্লোকে করা হয়। তবে মনের কথা ভগবানের কাছে তুলে ধরতে যে ভাষা সহজ সে ভাষাতেই প্রার্থনা করতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর কাছে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা করতে হয়।

কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়?

প্রার্থনা করতে বসার জন্য কিছু নিদিষ্ট নিয়ম আছে। কিছু আসন আছে। বিশেষ নিয়মে এবং বিশেষভাবে বসার নাম আসন। হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় পরবো। তারপর প্রার্থনায় বসবো। সরল মনে প্রার্থনা করতে হয়।

প্রার্থনার সময় মাথা, ঘাড় ও পিঠ সোজা রাখতে হয়। উত্তরমুখী কিংবা পূর্বমুখী বসে প্রার্থনা করতে হয়।

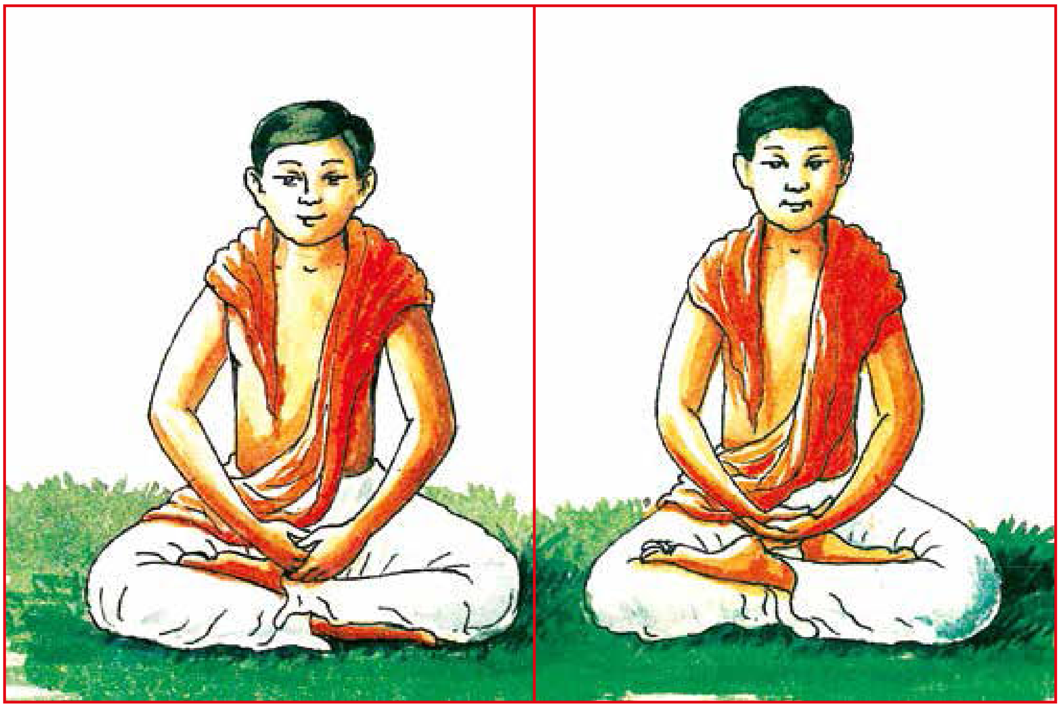

সুখাসন **পদ্মাসন**

বলো তো দেখি :

১। প্রার্থনা কাকে বলে?

২। প্রার্থনায় কী করতে হয়?

৩। কয়বার প্রার্থনায় বসা উচিত?

৪। প্রার্থনায় **কীভাবে** বসতে হয়?

পাঠ – ৩

অন্যের সাথে আচরণ

আমরা জেনেছি যে ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া কেউ চলতে ফিরতে বা বাঁচতে পারে না। তাই আমরা সনাতন ধর্মের অনুসারী সবাই বিশ্বাস করি "যত্র জীব, তত্র শিব"। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মাঝেই ঈশ্বর আছেন।

আমার যেমন ভালো লাগা, মন্দ লাগা, দুঃখ ও কষ্ট আছে, অন্য সকল জীবেরও তা আছে। এই বিশ্বাসে তাহলে আমরা সবার সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করবো? ভালো ব্যবহার করবো। আমরা খেয়াল রাখবো, যেন কেউ আমাদের ব্যবহারে দুঃখ না পায়।

সকলের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে হবে। কার সাথে কীরূপ ব্যবহার করবো, এ ব্যাপারে আরও ভালো করে জেনে নিই :

পিতা–মাতার প্রতি ব্যবহার

এ সংসারে আমাদের সবচেয়ে কাছের এবং আপন কারা? আপন হলেন মা–বাবা। মা-বাবা আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন।

পৃথিবীতে তাঁদের ঋণ কোনো দিন শোধ করা যায় না। ঈশ্বরের পরেই তাঁদের স্থান। আমাদের জন্য মা–বাবা কী কী করেছেন একটু চিন্তা করি। তাঁরা যদি লালন–পালন না করতেন, তাহলে আজকের আমি বা আমরা কোথায় থাকতাম। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মা-বাবা সন্তানের মঙ্গলের জন্য সর্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন এবং সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও আমাদেরকে যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সর্বোত্তম চেষ্টা করেন। পৃথিবীতে সন্তানের জন্য মা-বাবার মত এ নিঃস্বার্থ ত্যাগ আর কারো নেই।

তাই আমাদের কী করা উচিত?

উচিত–

- পিতা–মাতাকে ভক্তি করা।
- পিতা–মাতার আদেশ মেনে চলা।
- পিতা–মাতাকে দুঃখ না দেওয়া।

পিতা সম্পর্কে আমাদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে –

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

অর্থাৎ পিতা স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতাকে খুশি করলে সকল দেবতা খুশি হন।

মাতা সম্পর্কে বলা হয়েছে –

নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
অর্থাৎ মায়ের সমান গুরু নেই।

গণেশের মাতৃভক্তি সম্পর্কিত গল্পটি শোনাই।

গণেশের মাতৃভক্তি

দেবী দুর্গার দুই ছেলে। কার্ত্তিক আর গণেশ। কার্ত্তিক ভাবতেন, তিনি মাকে বেশি ভালবাসেন। এই নিয়ে ছিলো তাঁর গর্ব। কিন্তু গণেশ কিছু বলতেন না। চুপচাপ থাকতেন।

মা দুর্গা তাঁদের মনের কথা জানতেন। একদিন তিনি তাঁদের ডাকলেন। বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আগে সমগ্র পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে? যে আগে ঘুরে আসতে পারবে, তাঁকে আমার রত্নমালা দেবো।"

কার্ত্তিকতো খুব খুশি। গণেশের দিকে তিনি তাকালেন আর মনে মনে হাসলেন। কারণ তাঁর বাহন ময়ূর। আর গণেশের বাহন ইঁদুর। কার্ত্তিক ভাবলেন গণেশের আগেই তিনি ময়ূরে চড়ে পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবেন।

কার্ত্তিক বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু গণেশের মনে কোনো চিন্তা নেই। তিনি জানতেন, মা বিশ্বময়ী। মায়ের বাইরে আবার বিশ্ব কী? তিনি হাত জোড় করে মাকে প্রদক্ষিণ করলেন। গণেশের এই মাতৃভক্তি দেখে মা খুশি হলেন। গণেশের গলায় তিনি পরিয়ে দিলেন তাঁর রত্নমালা।

শিক্ষকের প্রতি আচরণ

সংসারে পিতা–মাতার পরই শিক্ষকের অবস্থান। তাঁদের মান্য করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। শিক্ষকবৃন্দ আমাদের পড়ালেখা শিখিয়ে শিক্ষিত করে তোলেন।

প্রত্যেক ছাত্র–ছাত্রীর উচিত, শিক্ষকবৃন্দকে দেখলে তাঁদেরকে নমস্কার দেয়া। তাঁরা দুঃখ পাবেন, এমন কাজ না করা। তাঁদের সামনে কোনো খারাপ আচরণ কিংবা খারাপ কাজ করা উচিত নয়।

বড়োদের প্রতি আচরণ

আমাদের থেকে যারা বয়সে বড়ো তাঁরা আমাদের গুরুজন। তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকা উচিত। বড়োদের সাথে ভালোভাবে কথা বলবো। তাঁদেরকে প্রথমেই নমস্কার জানাবো এবং তাঁদের সাথে কোনো প্রকার খারাপ ব্যবহার করবো না।

ছোটদের প্রতি ব্যবহার

আমরা নিজেরাই ছোট, আমরা কতকিছু জানি না বা পারি না। তাই মনে রাখবো আমাদের চেয়েও যারা ছোট, তারা তো আরও কতকিছু জানে না, পারে না। ছোটদের আদর করবো এবং ভালো কাজে উৎসাহ দেবো। মনে রাখবো, ছোটরা শেখে কিন্তু বড়দের কাছ থেকে। আমি যেমন ব্যবহার করবো, ছোটরাও তেমন করতে চেষ্টা করবে। তাই সব সময় মনে রাখবো যেন খারাপ কিছু তাদের সাথে আমরা না করি। ছোটদের ভালবাসবো, আদর করবো আর ভালো কাজে উৎসাহ যোগাবো।

জীবের প্রতি ব্যবহার

সব কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাই সব কিছুতেই ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রতিটি জীবই মানুষের কাজে আসে। বাড়ির গৃহপালিত পশুপাখিসহ সকল জীবকে আমরা ভালবাসবো।

বলো তো দেখি :

১। প্রত্যেক জীবের মধ্যে কে থাকেন?

২। সবার সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে হয়?

৩। পিতা সম্পর্কে আমাদের ধর্মগ্রন্থে কী বলা হয়েছে?

৪। মাতা সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থে কী বলা হয়েছে?

৫। শিক্ষক ও গুরুজনদের দেখলে কী করতে হয়?

৬। ছোটদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়?

৭। পশু-পাখিদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়?

পাঠ – ৪

নিত্যকর্ম

নিত্যকর্ম বলতে বোঝায় প্রতিদিনের কাজ। নিজের প্রতিদিনের কাজগুলোই হচ্ছে নিত্যকর্ম।

যদি আমাদের মধ্যে কেউ প্রতিদিনের কাজের বিবরণ দেয়, তবে তা হতে পারে নিম্নরূপঃ

- ভোরে ঘুম থেকে উঠা।
- উঠে সূর্য প্রণাম করা এবং হাতমুখ ধোয়া।
- কিছু খাবার খাওয়া।
- পড়ালেখা করা।
- স্নান করে ভাত খাওয়া।
- স্কুলে আসা।
- ছুটি হলে স্কুল থেকে বাড়িতে যাওয়া।
- হাতমুখ ধুয়ে আবার কিছু খাওয়া।
- এরপর খেলাধুলা করা।
- বড়োদের কথামত কাজ করা।
- পড়ালেখা শেষে রাতের খাবার খাওয়া, দাঁতমাজা ও ঘুমাতে যাওয়া।
- হাত জোড় করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে শুয়ে পড়া।

তোমার এ বর্ণনার মতোই প্রতিদিনের একটি কাজের তালিকা বানিয়ে তা মেনে চলাই হচ্ছে নিত্যকর্ম করা।

তবে সবসময়ে খেয়াল রাখবে নিচের কাজগুলো ঠিকমতো করার :–

১। সূর্য ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠবো এবং হাতমুখ ধুয়ে প্রার্থনায় বসবো।

২। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবো এবং সবসময় পরিষ্কার জামা-কাপড় পরবো।

৩। প্রতিদিন পড়ালেখা শিখবো। শিক্ষকের দেয়া কাজ করবো।

৪। মা–বাবা কোনো কাজ করতে বললে সেই কাজ করবো।

৫। শরীরের প্রতি যত্ন নেবো এবং নিয়মিত ব্যায়াম করবো।

৬। প্রতিদিন খাবারের আগে এবং টয়লেট ব্যবহারের পর হাত ধোব।

৭। খাবারের পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে দাঁত পরিষ্কার করবো।

৮। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে ঘুমাতে যাবো।

৯। সকল কাজ শুরুর আগে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে কাজ শুরু করবো।

এরূপ কাজের মধ্য দিয়ে ছোটোকাল থেকেই নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

বলো তো দেখি:

১। নিত্যকর্ম কী?

২। প্রতিদিন কী করা উচিত?

৩। খাবারের আগে এবং পরে কী করা উচিত?

৪। সকল কাজ শুরুর আগে কাকে স্মরণ করতে হয়?

৫। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে কী করা উচিত?

পাঠ – ৫

সত্য–মিথ্যার ধারণা

সত্য কী?

সত্য হচ্ছে সেই ঘটনা যা ঘটলো। অর্থাৎ যে কাজটি হলো তাই সত্য। সত্যই ধর্ম। সৎ জীবনের জন্য সত্য কথা বলতে হবে। যারা সত্য কথা বলে তাদের মনে সাহস থাকে। সত্য কথা বলবো। সৎ পথে চলবো।

মিথ্যা কী?

মিথ্যা হচ্ছে সেই বর্ণনা যা ঘটেনি, অথচ বলা হচ্ছে ঘটেছে। মিথ্যাবাদীরা সবসময় দুর্বল থাকে এবং তাদের অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হয়।

সকল ধর্মেই বলা হয়েছে, সত্য বলবে, মিথ্যা বলবে না। আমরাও মনে রাখবো, সত্য বলবো মিথ্যা নয়। সত্য চিরন্তন, মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী। তাহলে আমাদের কী করা উচিত? আমাদের উচিত সবসময় সত্য কথা বলা। মিথ্যা না বলা। মিথ্যা বলা মহাপাপ। আমরা কেউ মিথ্যা বলবো না। মনে রাখতে হবে সবসময় সত্যেরই জয় হবে।

মিথ্যা বললে কী হয় সে সম্পর্কে একটি গল্প শোনাই -

এক রাখাল জঙ্গলের কাছে গরু চরাতো। সে একদিন বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে বলে চিৎকার দিল। আশপাশের লোকজন লাঠি নিয়ে এলো, বর্শা

নিয়ে এলো। রাখাল হা-হা করে হাসতে লাগলো। বললো, আমি মিছামিছি সবাইকে নিয়ে এসেছি। এমন করে আরেকদিনও রাখাল ছেলে বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে বলে চিৎকার করলো। আবারও আশপাশের মানুষ লাঠি, বর্শা এসব নিয়ে ছুটে এলো। ছেলেটি আবারও হা-হা করে হাসলো। বললো- আমি সবাইকে মিছামিছি ভয় দেখিয়েছি। সবারই রাগ হলো। কিন্তু কি আর করা। যে যার পথে চলে গেলো।

নেকড়ে বাঘ ও বালক

অন্য একদিনের কথা। রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছিল। এমনসময় সেখানে সত্যি সত্যি বাঘ এলো। ছেলেটি বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে বলে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু পর পর দু'দিন মিথ্যা বলায় সেদিন আর গ্রামের লোকজন এগিয়ে এলো না। বাঘ রাখাল ছেলেকে মেরে ফেললো। মিথ্যাবাদী রাখাল ছেলে এমনিভাবে মিথ্যা বলার জন্য জীবন দিল।

সুতরাং আমরা মনে রাখবো , মিথ্যা কথা হলো খারাপ কাজের আসল কারণ। অন্যায় করার জন্য মিথ্যা বলতে হয়। একবার একজন গুরুর কাছে তাঁর শিষ্য বলেছিলো যে, সে চুরি করে। এটি তার নেশা। কিছুতেই চুরি ছাড়তে পারবে না। গুরু বললেন, ঠিক আছে, তুমি চুরি কর। কিন্তু মিথ্যা বলো না। শিষ্য রাজি হলো।

সন্ধ্যায় শিষ্য এক জায়গায় চুরি করতে যাবে। পথে দেখা হলো তার এক প্রতিবেশীর সাথে। প্রতিবেশী জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় যাচ্ছ? তখনই তার গুরুকে দেয়া প্রতিজ্ঞার কথা মনে হলো। মিথ্যা বলা যাবে না। শিষ্য চুরি না করেই সেদিন ফিরে এলো। পর পর কয়েকদিন এরকম ঘটনা ঘটলো। এরপর শিষ্য ঠিক করলো, আর চুরি করবে না। কী বোঝা গেল? সত্যি কথা বললে চুরি করা যায় না। শুধু চুরি নয়, সত্যি কথা বললে কোন অন্যায় কাজই করা যায় না। মিথ্যা বললে কারো না কারো ক্ষতি হয়। কখনও কখনও নিজেরও ক্ষতি হয়। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না, ভালোবাসেনা।

মিথ্যা গল্পে অন্যের মনে আঘাত লাগে। মিথ্যাবাদীরা মানুষকে ঠকায়। কোনো কোনো লোক এমনভাবে মিথ্যা বলে, মনে হয় যেন সত্যি। এরকম লোক ঠক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলবো না।

বলো তো দেখি :

১। সত্য কী?

২। সত্য বললে কী হয়?

৩। মিথ্যা কী?

৪। মিথ্যা বললে কী হয়?

পাঠ – ৬

দেব–দেবীর ধারণা

দেব–দেবী কী?

সনাতন ধর্মে বহু দেব–দেবী আছে। এ সকল দেব–দেবী হচ্ছেন ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আমরা জানি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো কিছু করতে বা হতে পারেন। হিন্দুরা ঈশ্বরের বিভিন্নরূপ কল্পনা করে তাঁর আকার বা চেহারা দিয়েছে। অর্থাৎ সনাতন ধর্মে বিভিন্ন রূপে ঈশ্বরকে দেখানো হয়েছে। তাইতো সনাতন ধর্মে অনেক দেব–দেবী আছেন। আমরা দেব–দেবীর পূজা করি কেন? কারণ দেব–দেবীর পূজা করলে তাঁরা খুশি হন। আর দেব–দেবীরা খুশি হলে ঈশ্বর খুশি হন এবং আমাদের মঙ্গল করেন। তাঁরা মূলত ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ।

আমরা দেব হিসেবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবের পূজা করি। আর দেবী রূপে পূজা করি দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীসহ আরও অনেক দেবীকে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যে বহু দেব–দেবীর পূজা করি, তাঁরা কিন্তু কেউ ঈশ্বর নন, তাঁরা ঈশ্বরের সাকার রূপ।

বিভিন্ন দেব–দেবীর ছবিসহ তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো :

ব্রহ্মা

ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। অর্থাৎ ব্রহ্মার মাধ্যমেই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি কাজ সম্পন্ন করেন। ব্রহ্মার চার হাত, চার মুখ। ব্রহ্মার গায়ের রং আগুনের মতো উজ্জ্বল। হাঁস তাঁর বাহন, লাল পদ্ম তাঁর আসন।

শ্রীশ্রী ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্র :

'ওঁ চতুর্বদন–সদ্মস্থ-চতুর্বেদ কুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥'

সরলার্থঃ হে ভগবান বিশ্বেশ্বর, বিশ্বধাম, জগতের সৃষ্টিকারী, তোমাকে নমস্কার। হে পৃথিবীপতি, সপ্ত সূর্যরশ্মির আশ্রম, সকলের অন্তরে অবস্থানকারী, তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার।

বিষ্ণু

ঈশ্বরের পালন করার গুণের প্রকাশ হচ্ছে বিষ্ণু রূপ। অর্থাৎ বিষ্ণুর মাধ্যমেই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবকে পালন করে থাকেন। বিষ্ণুর চারটি হাত। হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বিষ্ণুর গায়ের রং চাঁদের আলোর মতো। তাঁর বাহন গরুড় পাখি। সকল পূজার আগেই বিষ্ণুর নাম নিতে হয়।

শ্রীশ্রী বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র :

'ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতে শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণং নমোঽস্তুতে ॥'

সরলার্থ: ব্রহ্মাণ্যদেবকে অর্থাৎ বিষ্ণুকে নমস্কার। পৃথিবী, ব্রাহ্মণ এবং জগতের হিতকারী বা মঙ্গলকারী কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে বারবার নমস্কার করি।

শিব

ঈশ্বর যে রূপে ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। তবে শিবের এই ধ্বংসের কাজ চলে অসুন্দরের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যত অসুন্দর আছে তা তিনি ধ্বংস করেন। শিবের গায়ের রং বরফের মতো সাদা। তাঁর মাথায় জটা, কপালে বাঁকা চাঁদ। বৃষ অর্থাৎ ষাঁড় তাঁর বাহন। আর পরণে বাঘের চামড়া। ফাল্গুন মাসের শিব চতুর্দশী তিথিতে বিশেষভাবে শিবের পূজা করা হয়।

শ্রীশ্রী শিবের প্রণাম মন্ত্র :

'ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।'

সরলার্থ: তিন কারণের (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের) হেতু শান্ত শিবকে প্রণাম। হে পরমেশ্বর তুমিই পরমগতি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পন করি।

কার্ত্তিক

কার্ত্তিককে বলা হয় শক্তি ও সুন্দরের দেবতা। তিনি দেবতাদের সেনাপতি। যুদ্ধেই তাঁর আসল পরিচয়। গায়ের রং মা দুর্গার মতো অর্থাৎ অতসী ফুলের মতো হলদে ফর্সা। দেখতে তিনি খুব সুন্দর। তাঁর হাতে ধনুক। তাঁর বাহন ময়ূর। কার্তিক মাসের শেষ দিনে বেশ আনন্দের সাথে কার্ত্তিক পূজা হয়।

শ্রীশ্রী কার্ত্তিকের প্রণাম মন্ত্র :

'ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগে গৌরিহৃদয় নন্দন।
কুমার রক্ষ মাং দেব দৈত্যার্দন নমোঽস্তুতে ॥'

সরলার্থ: হে মহাভাগ, গৌরী পুত্র, দৈত্যদলনকারী, কার্ত্তিক দেব, আমাদেরকে রক্ষা কর, তোমাকে নমস্কার।

গণেশ

গণেশকে বলা হয় সিদ্ধিদাতা। সিদ্ধি মানে সফলতা। অর্থাৎ কোনো কাজে ভালো ফল পেতে তাঁর আশীর্বাদ লাগে। গণেশের মুখ হাতির মতো। গায়ের রং লালচে। তাঁর চার হাত একটু বেঁটে এবং পেটটা একটু মোটা। তাঁর বাহন ইঁদুর। ব্যবসায়ীগণ গণেশ পূজা বেশি করে থাকেন, কারণ তিনি খুশি হলে ব্যবসায়ে উন্নতি হয়।

শ্রীশ্রী গণেশের প্রণাম মন্ত্র :

‘ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্ ।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥’

সরলার্থ: যিনি একদন্ত, মহাকায়, লম্বোধর, গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী সেই হেরম্বদেবকে আমি প্রণাম করি।

বিশ্বকর্মা

দেবতাদের মধ্যে যিনি বাড়িঘর বা যন্ত্রপাতি তৈরি করেন তিনিই হচ্ছেন বিশ্বকর্মা। যাঁরা বিভিন্ন কারিগরি কাজ করে থাকেন বা যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করেন, তাঁরা বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। ভাদ্র মাসের শেষ দিনে বিশ্বকর্মার পূজা হয়। বিশ্বকর্মার চারটি হাত। তাঁর বাহন হাতি।

শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মার প্রণাম মন্ত্র :

‘ওঁ দেবশিল্পিন্ মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধকঃ।
বিশ্বকর্মণ্ নমস্তুভ্যং সর্বাভীষ্টপ্রদায়ক ॥’

সরলার্থ: হে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, আপনি মহান, দেবগণের কার্যসম্পাদক, সর্ব অভীষ্ট পূরণকারী। আপনাকে প্রণাম।

শ্রীশ্রী দুর্গা দেবী

ঈশ্বরের শক্তি রূপের প্রকাশ শ্রীশ্রী দুর্গা। দুর্গা দুর্গতি নাশেরও দেবী। দুর্গার দশটি হাত। দশ হাতে দশটি অস্ত্র। তিনি এই অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে অসুরদের ধ্বংস করেন। দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো। তাঁর মুখ সুন্দর। চোখ তিনটি। তাঁর বাহন হলো সিংহ। তিনি মাতৃরূপেরও প্রকাশ। আমাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে জাঁকজমকভাবে দুর্গা পূজা হয়। শরৎকালে পূজা হয় বলে শারদীয় পূজা বলে। এই পূজাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে সবচেয়ে বেশি আনন্দ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বসন্তকালে বাসন্তী নামেও দেবী দুর্গার পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শ্রীশ্রী দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্র :

'ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥'

সরলার্থ: হে সর্বমঙ্গলদায়িনী, কল্যাণময়ী, সর্বার্থপ্রদানকারিণী, আশ্রয়-স্বরূপিণী, ত্রিনয়না, হে গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

শ্রীশ্রী সরস্বতী দেবী

ঈশ্বর যে রূপে বিদ্যা দেন তাঁর নাম সরস্বতী। অর্থাৎ জ্ঞানের দেবী বা বিদ্যার দেবী হচ্ছেন সরস্বতী। সরস্বতী দেবীর গায়ের রং ও বেশ সবই সাদা। সাদা পদ্ম তাঁর আসন। রাজহাঁস তাঁর বাহন। এক হাতে বীণা অন্য হাতে বই। মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাই সরস্বতী পূজা বেশি করে থাকে। বিদ্যা লাভের আশাতেই এ দেবীর পূজা করা হয়। তাঁর বাহন হাঁস। এ হাঁস বাহনের মানে হচ্ছে, দুধ আর জল মিশিয়ে দিলে হাঁস তা থেকে শুধু দুধটুকু খায়, জল খায় না। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এ থেকে শিক্ষা নেবেন যে, জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হয়ে কেবল সারটা গ্রহণ করবো।

শ্রীশ্রী সরস্বতী দেবীর প্রণাম মন্ত্র :

'ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥'

সরলার্থ: হে মহাভাগ সরস্বতী, বিদ্যাদেবী, কমলনয়না, বিশ্বরূপা, বিশালাক্ষী আমাকে বিদ্যা দাও। তোমাকে নমস্কার।

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী দেবী

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী হচ্ছে ধনসম্পদের দেবী। ধনসম্পদ পেতে হলে শ্রীশ্রী লক্ষ্মী দেবীর আশীর্বাদ লাগে। প্রত্যেক ঘরেই আমাদের মায়েরা লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীব্রত পালন করা যায়। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেঁচা বাহনের মানে হচ্ছে পেঁচা দিনে দেখে না, দেখে রাতে। (অর্থাৎ সৎ পথে অর্থ আন, অসৎ পথে নয়)। অন্ধকার হচ্ছে অসৎ পথের চিহ্ন। পেঁচা দেখেন, কে অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করে। পেঁচা যমরাজেরও দূত। অসৎ পথের ধন লাভকারীদেরকে পেঁচা চিহ্নিত করে যমরাজকে জানান।

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী দেবীর প্রণাম মন্ত্র :

“ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে॥’

সরলার্থ: বিশ্বের সকল গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, যিনি পদ্মের উপর বসে আছেন, যিনি মঙ্গল লক্ষ্মীরূপী, সেই দেবীকে প্রণাম।

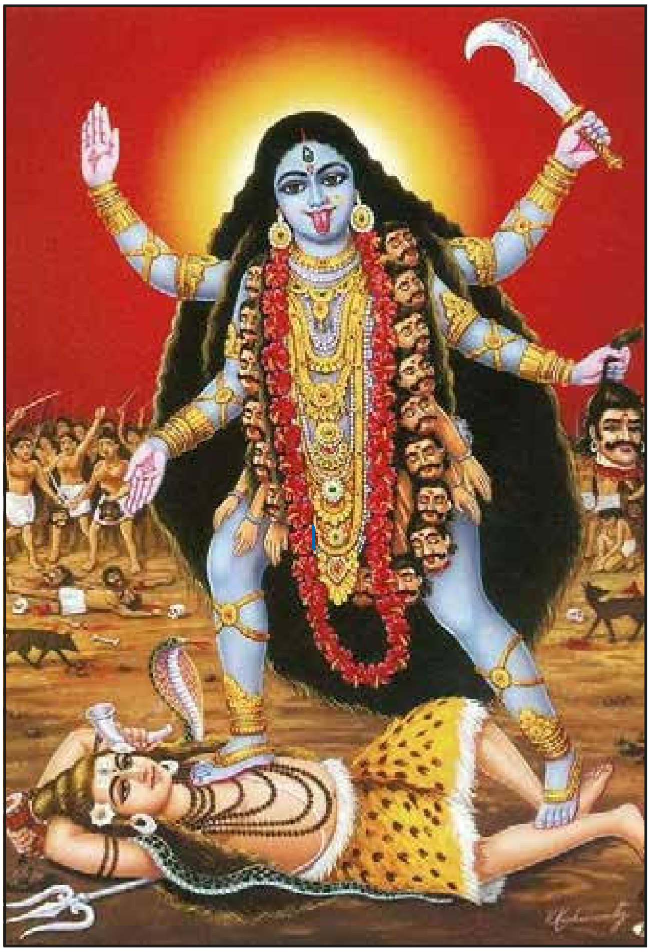

শ্রীশ্রী কালী

ঈশ্বরের শক্তি রূপের আরেক প্রকাশ হচ্ছে শ্রীশ্রী কালী। তিনি অন্যায়কে ধ্বংস করেন। কালীর মূর্তিতে দেখা যায় যে, তিনি জিহ্বা বের করে আছেন। এখানে তিনি লাল জিহ্বাকে সাদা দাঁত দিয়ে কামড়ে রেখেছেন। কালীর চারটি হাত। হাতে অস্ত্র, কাটা মাথা আর গলায় ধ্বংসের পরিচায়ক কাটা মাথার মালা। কালী শক্তির প্রতীক। শক্তিতেই প্রকাশিত হয় শক্তিমান। শিব মানে মঙ্গল। মহাধুমধামে কালী পূজা করা হয়।

শ্রীশ্রী কালী মায়ের প্রণাম মন্ত্র :

'ওঁ কালী কালী মহাকালী কালীকে পাপহারিণী।
সর্বপাপ হরে কালী জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥'

সরলার্থ: হে কালী, তুমি মহাকালী, সকল পাপ হরণ করো, তুমি পাপহারিনী, তোমার জয় হোক। তোমাকে নমস্কার।।

বলো তো দেখি:

১। ব্রহ্মা কে?

২। বিষ্ণু কে?

৩। শিব কে?

৪। কার্ত্তিক কে?

৫। গণেশ কে?

৬। বিশ্বকর্মা কে?

৭। দুর্গা কে?

৮। সরস্বতী কে?

৯। লক্ষ্মী কে?

১০। কালী কে?

শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা দেবী

পাঠ – ৭

মন্দির ও তীর্থস্থান

মন্দির কাকে বলে?

আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অর্থাৎ হিন্দুরা পূজা করি বিভিন্ন দেব–দেবীকে। পূজা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো সময় বা দিনে নির্দিষ্ট দেব–দেবীর উদ্দেশ্যে ফুল, জল এবং নৈবেদ্য উৎসর্গ করে ঐ দেব–দেবীকে শ্রদ্ধা জানানো।

এই যে দেব–দেবীর উদ্দেশ্যে ফুল-জল দিয়ে তাঁকে রাখার জন্য যে ঘর নির্মিত হয়, তাকেই বলা হয় মন্দির। আমাদের অধিকাংশ বাড়িতেই গৃহদেবতা কিংবা অন্য কোনো দেবতার মন্দির আছে। আসল কথা মন যেখানে স্থির হয়, তার নামই মন্দির।

মন্দিরের নামকরণ হয় কীভাবে?

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন দেব–দেবীর পূজার্চনা হয়। সাধারণত যে দেব–দেবীর পূজা যে মন্দিরে হয় সেই মন্দিরের নাম ঐ দেব–দেবীর নাম অনুসারেই হয়। যেমন– শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, শ্রীশ্রী কালী মন্দির, শ্রীশ্রী লক্ষ্মী মন্দির, শ্রীশ্রী সরস্বতী মন্দির, শ্রীশ্রী হরি মন্দির, শ্রীশ্রী বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি।

শ্রীশ্রী রাসবিহারী ধাম, চট্টগ্রাম

শ্রীশ্রী মনাই পাগলের আশ্রম, বরিশাল

তীর্থস্থান বলতে কী বোঝ?

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোনো মহৎ কর্ম যে স্থানে হয় অথবা কোনো মহৎ ব্যক্তি তাঁর কর্মকাণ্ড যে স্থানে পরিচালনা করেন সেই স্থানটিও পবিত্র। সেই স্থানে ভ্রমণ করলে বা গেলে মনের কালিমা দূর হয়। মন পবিত্র হয়। আর এর মাধ্যমে মনে শান্তি আসে।

এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট কোনো স্থান পবিত্র স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলে তাকে তীর্থস্থান বলে। তীর্থস্থান ভ্রমণ সকলের জন্য ভালো।

আমাদের দেশে তীর্থস্থানগুলোর মধ্যে চন্দ্রনাথ (সীতাকুণ্ড-চট্টগ্রাম), আদিনাথ (মহেশখালী-কক্সবাজার), শ্রীশ্রী চণ্ডীতীর্থ মেধস মুনির আশ্রম (চট্টগ্রাম), পুণ্ডরীকধাম (চট্টগ্রাম), তারাপাশা (মৌলভীবাজার), লাঙ্গলবন্ধ, বারদী (নারায়ণগঞ্জ), ঢাকা দক্ষিণ (সিলেট), হিমাইতপুর (পাবনা) , শ্রীঅঙ্গন (ফরিদপুর), তারাবাড়ি (বরিশাল), খেতুরীধাম (রাজশাহী), হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি (বেনাপোল), রূপসনাতনধাম (যশোর), ওড়াকান্দি (গোপালগঞ্জ), কদমবাড়ী (মাদারীপুর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রনাথধাম, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

লাঙ্গলবন্ধ তীর্থস্থান, নারায়ণগঞ্জ

শ্রীশ্রী চণ্ডীতীর্থ মেধস মুনির আশ্রম, চট্টগ্রাম

নিম্নে আরো কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম দেয়া হলো:

গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, দ্বারকা, অযোধ্যা, তারাপীঠ, গঙ্গাসাগর, প্রয়াগ, কন্যাকুমারী ইত্যাদি। এ তীর্থস্থানগুলো সব ভারতে অবস্থিত।

শ্রীশ্রী হরিদ্বার মন্দিরের দৃশ্য

শ্রীশ্রী শিব মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী

বলো তো দেখি :

১। পূজা কী ?

২। মন্দির কী ?

৩। কীভাবে মন্দিরের নাম রাখতে হয়?

৪। তীর্থস্থান কাকে বলে?

৫। বাংলাদেশের দুটি তীর্থস্থানের নাম বল।

পাঠ – ৮

অবতার ও মহাপুরুষ

অবতার কাকে বলে?

আমরা যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী, তারা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর বিভিন্ন সময় আমাদের মাঝে বিভিন্নভাবে বা রূপে আসেন। দুষ্টকে শাস্তি আর ভালোকে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের শক্তি, ভিন্ন কোনো রূপে আমাদের মাঝে নেমে আসাকে অবতার বলে।

আমরা দশজন অবতার সম্পর্কে জানি। সেই অবতারগণের নাম ও ছবি তোমাদের জানার জন্য দেয়া হলো:

দশজন অবতার হলেন :

১. মৎস্য অবতার
২. কূর্ম অবতার
৩. বরাহ অবতার
৪. নৃসিংহ অবতার
৫. বামন অবতার
৬. পরশুরাম অবতার
৭. রাম অবতার
৮. বলরাম অবতার
৯. বুদ্ধ অবতার
১০. কল্কি অবতার

মৎস্য অবতার

কূর্ম অবতার

বরাহ অবতার

নৃসিংহ অবতার

বামন অবতার

পরশুরাম অবতার

রাম অবতার

বলরাম অবতার

বুদ্ধ অবতার

কল্কি অবতার

বলো তো দেখি :

১। অবতার কাকে বলে ?

২। অবতার কতজন?

৩। দুজন অবতারের নাম বল।

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী

মহাপুরুষ কাকে বলে?

আমরা জানি, প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু তাই বলে সকলের মধ্যে সমানভাবে ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। কারো কারো ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায়। যাঁদের মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকাশ ঘটে, তাঁদেরকে আমরা বলি মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী।

নিচে বেশ কজন মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারীর পরিচয় দেয়া হলো :

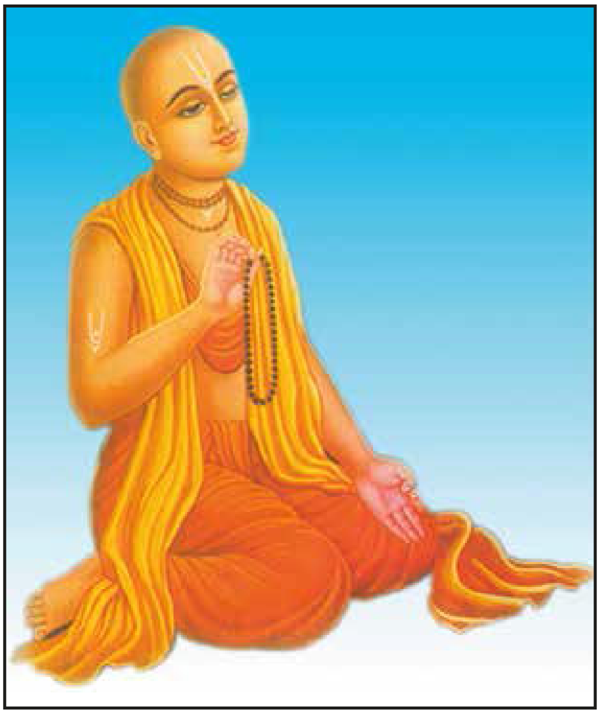

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু

জন্ম : ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ভারতের নবদ্বীপে।

বাবা : শ্রী জগন্নাথ মিশ্র।

মা : শ্রীমতী শচীদেবী।

দেহত্যাগ : ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দিরে নিজেকে বিলীন করেন।

বর্তমানের বৈষ্ণব সমাজ মহাপ্রভুর মতাদর্শ প্রচার ও পালন করে চলেছে। এক্ষেত্রে **'ইসকন'** ও **'গৌড়ীয় মঠ'** এর নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

জন্ম : ১২৪২ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভারতের হুগলী জেলার কামারপুকুরে।

বাবা : শ্রী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

মা : শ্রীমতী চন্দ্রমনি দেবী।

দেহত্যাগ : ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত **শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন** বর্তমানে তাঁর আদর্শ প্রচার করছে।

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

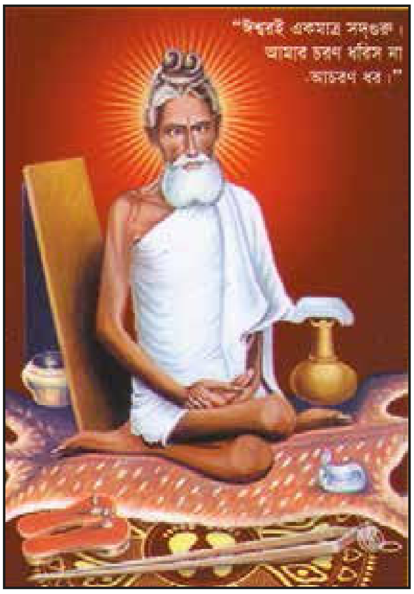

জন্ম : ১১৩৭ সালে ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের কাছাকাছি কচুয়া গ্রামে।

বাবা : শ্রী রামকানাই ঘোষাল।

মা : শ্রীমতী কমলা দেবী।

দেহত্যাগ : ১২৯৭ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

বালক বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্থানের লোকনাথ আশ্রম তাঁর আদর্শ প্রচার করছে। **বারদী লোকনাথ মন্দির ও ঢাকার স্বামীবাগ মন্দির** এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

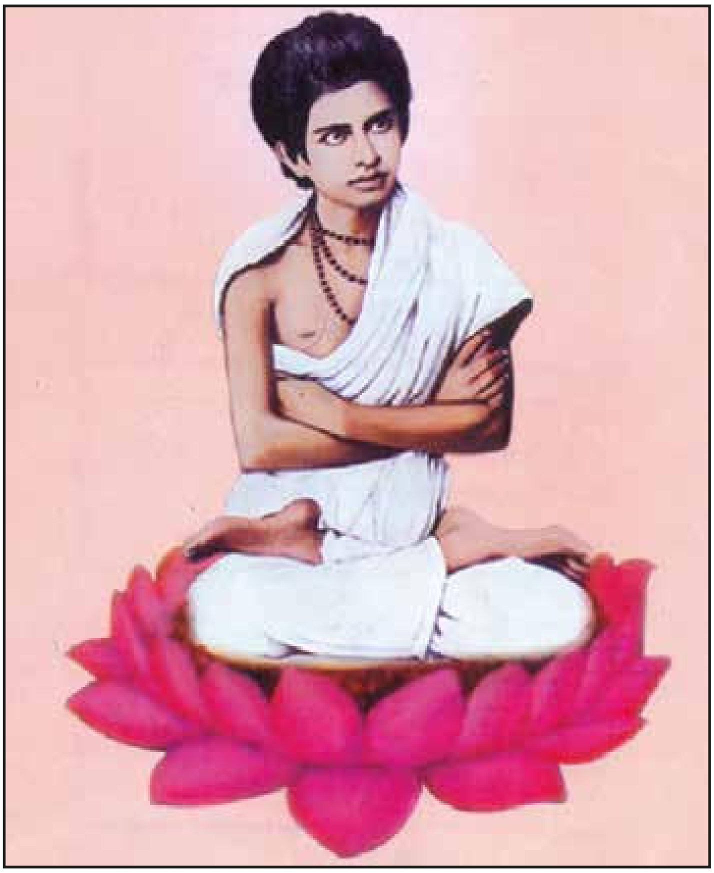

জন্ম : ১২৭৮ সালের ১৬ই বৈশাখ শুক্রবারের ব্রহ্ম মুহূর্তে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে সীতা নবমীতে জন্মগ্রহণ করেন। মূলবাড়ি ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম।

বাবা : শ্রী দীননাথ ন্যায়রত্ন।

মা : শ্রীমতী বামা দেবী।

দেহত্যাগ : ১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন।

ফরিদপুরের **শ্রীঅঙ্গন ও ঢাকাস্থ প্রভু জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ** তাঁর আদর্শ প্রচার করে চলেছে।

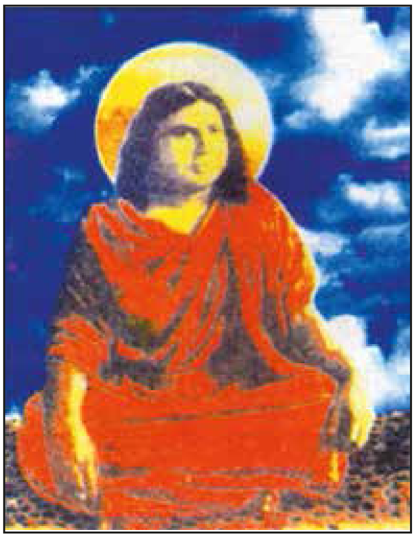

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ

জন্ম : ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মাদারীপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে।

বাবা : শ্রী বিষ্ণুচরণ ভুঁইয়া।

মা : শ্রীমতী সারদা দেবী।

দেহত্যাগ : ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ৪৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

প্রণব মঠ এবং **ভারত সেবাশ্রম সংঘ** তাঁর আদর্শ প্রচার করে চলেছে।

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর

জন্ম : ১২১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণীর দিনে ব্রহ্মমুহূর্তে গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি গ্রামে।

বাবা : শ্রী যশোমন্ত বৈরাগী।

মা : শ্রীমতী অন্নপূর্না দেবী।

দেহত্যাগ : ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ২৩ শে ফাল্গুন।

বর্তমানে **বাংলাদেশ মতুয়া মিশন** ও **বাংলাদেশ মতুয়া মহাসংঘ** তাঁর আদর্শের কথা প্রচার করে চলেছে।

শ্রীরাম ঠাকুর

জন্ম : ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামানিক গ্রামে।

বাবা : শ্রী মাধব চক্রবর্তী ।

মা : শ্রীমতী কমলাদেবী।

দেহত্যাগ: ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ।

নোয়াখালীর চৌমুহনী **রামঠাকুর আশ্রম** ও চট্টগ্রামের **কৈবল্যধাম** তাঁর আদর্শের বাণী প্রচার করে চলেছে।

মা আনন্দময়ী

জন্ম : ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খেওড়া গ্রামে।

বাবা : শ্রী বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য ।

মা : শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী।

দেহত্যাগ: ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট।

রমনার আনন্দময়ী আশ্রম উল্লেখযোগ্য হলেও আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি ও তাঁর নিজ গ্রামেও একটি আশ্রম আছে।

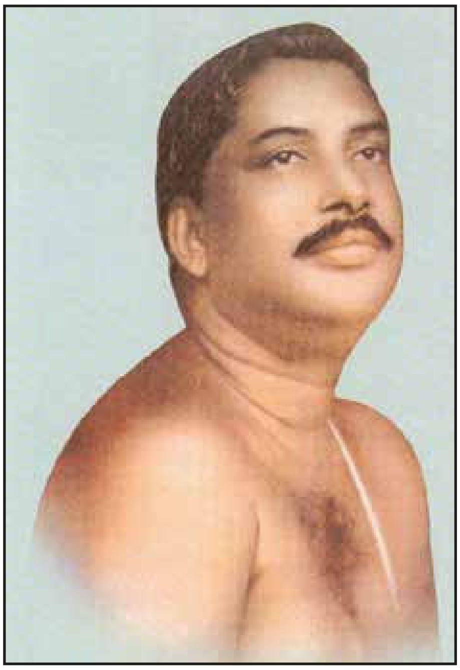

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

জন্ম : ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৩০ শে ভাদ্র তালনবমীতে পাবনা জেলার হিমাইতপুরে।

বাবা : শ্রী শিবচন্দ্র চক্রবর্তী।
মা : শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী।
দেহত্যাগ : ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি।

বিভিন্ন স্থানের সৎসঙ্গ আশ্রম তাঁর আদর্শের কথা প্রচার করে চলেছে। বাংলাদেশে হিমাইতপুর সৎসঙ্গ বিশেষ অবদান রাখছে এ ব্যাপারে।

শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ

জন্ম : ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর চাঁদপুর জেলার পুরাতন আদালত পাড়ায়।

বাবা: শ্রী সতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলী।
মা: শ্রীমতী মমতা দেবী।
বাল্যকালে নাম ছিল বঙ্কিম, ডাক নাম বল্টু। অখণ্ড সমাজ গঠনে নিজের কর্মতৎপরতায় ওঁ-কারের পূজা প্রবর্তনে সমবেত উপাসনা ব্যবস্থা চালু করেন।

দেহত্যাগ : ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল কলকাতায় গুরুধামে দেহত্যাগ করেন।

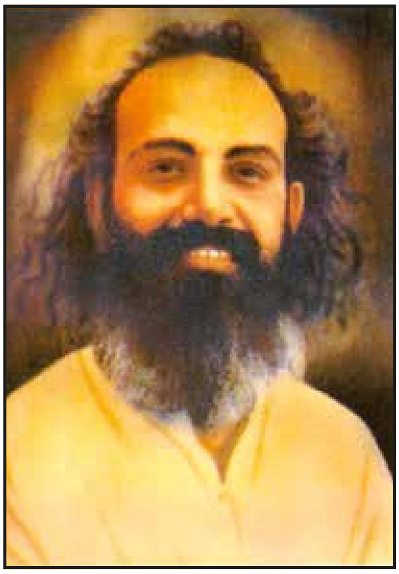

পাঠ – ৯

স্বর্গ ও নরক এবং ভালো মন্দ কাজ

স্বর্গ কী?

স্বর্গ হলো চির সুখের স্থান। সেখানে দুঃখের কোনো স্থান নাই। সেখানে শুধু সুখ, সুখ আর সুখ। অর্থাৎ আনন্দময়, উৎসবময়, মধুময় জীবন হচ্ছে স্বর্গময় জীবন। স্বর্গের রাজা হলেন ইন্দ্র।

দেবরাজ ইন্দ্র

স্বর্গে কারা বাস করে?

স্বর্গে বাস করেন দেবতারা, আর জীবের মধ্যে যাঁরা ভালো কাজ করে পুণ্য অর্জন করেন তাঁরা।

স্বর্গে কীভাবে যাওয়া যায়?

আমরা আমাদের ভালো কাজের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করে স্বর্গে যেতে পারি। ভালো কাজ অর্থাৎ যে কাজে কেউ দুঃখ পাবে না, কারো ক্ষতি হবে না, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন সেই ধরণের কাজ করলে আমরা স্বর্গ সুখ পাবো বা স্বর্গে যেতে পারবো।

নরক কী?

নরক হলো চির দুঃখ বা অশান্তির জায়গা। যেখানে শুধু দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ। সুখের কোনো স্থান সেখানে সেই। কান্না, বেদনা আর অসহ্য যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ জীবনই হলো নরকময় জীবন। নরকের রাজা হলেন যম।

নরকে কারা যায়?

যারা অন্যায়, অনৈতিক ও অবৈধ কাজ করে, তারা পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য নরকে যায়। পাপীরা নরকে বাস করে।

যমরাজ

ভালো কাজ কী?

আমরা প্রত্যেকেই কাজ করি। এই কাজের মধ্যে কোনো কোনো কাজে সবাই প্রশংসা করে, তাতে সবার মঙ্গল হয়। সবার মঙ্গল হয় এমন কাজ হচ্ছে ভালো কাজ। ভালো কাজে পুণ্য লাভ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

কাউকে দুঃখ না দেওয়া, মা–বাবা ও বড়দের ভক্তি করা ভালো কাজ।

মন্দ কাজ কী?

আমাদের সেই কাজগুলোকে মন্দ কাজ বলে, যে কাজগুলোর ফলে অন্যের ক্ষতি হয় কিংবা তারা দুঃখ পায়। পরনিন্দা, হিংসা, চুরি করা, অপরের ক্ষতি করা ইত্যাদি মন্দ কাজ। মন্দ কাজ করলে পাপ হয়।

পরের দ্রব্য না বলে নেওয়া, বিনা কারণে কাউকে আঘাত করা হচ্ছে মন্দ কাজ।

সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি ভালো কাজ কী আর মন্দ কাজ কী এবং উভয় কাজের ফলাফল কী। তাই আমরা এখন থেকেই যদি সতর্ক হই এবং ভালো কাজ করি, যদি মন্দ কাজ না করি তবে, আমরাও একদিন স্বর্গসুখ লাভ করতে পারবো।

পাঠ – ১০

ধর্মগ্রন্থ

ধর্মগ্রন্থ কী ?

আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী। সনাতন ধর্মের বিভিন্ন রীতিনীতি যে গ্রন্থে বা বইতে থাকে, আমরা তাকে ধর্মগ্রন্থ বলি।

কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থের নাম-

সনাতন ধর্মের আদি গ্রন্থ বা মূল হচ্ছে **"বেদ"**। এছাড়া **উপনিষদ্, শ্রীশ্রী চণ্ডী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত** উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সনাতন ধর্মের বহু ধর্মগ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সংক্ষেপে গীতা বলা হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্জুনকে উপদেশ দেন। আমরাও যদি সে উপদেশ মেনে চলি, তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে। গীতার অর্থ অনুধাবন করতে পারলে অন্যান্য শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আমরা বড় হয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কে আরও জানতে পারবো। সনাতন ধর্মানুসারী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের উচিত গীতা পাঠ করা।

এখানে পবিত্র গীতার কয়েকটি শ্লোক ভাবার্থসহ দেয়া হলো :

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক–৭)

অনুবাদ : যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়ে নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ দেহ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হই।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক–৮)

অনুবাদ : সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥”

(শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক–৩৮)

অনুবাদ : এ জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নাই। কর্মগুণে সিদ্ধ পুরুষ সেই জ্ঞান লাভ করলে নিজেই নিজ অন্তকরণ লাভ করেন।

“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥”

(শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১৮ অধ্যায়, শ্লোক–৬৬)

অনুবাদ : সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক করো না।

রামায়ণ

রামায়ণ হচ্ছে রাম ও রাবণের যুদ্ধকাহিনি। আমাদের দশ অবতারের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র এক অবতার। তিনি যে লীলা বা কর্ম এই পৃথিবীতে এসে করেছেন, তার বর্ণনা আছে এ গ্রন্থে।

রামায়ণে মোট সাতটি কাণ্ড আছে। প্রত্যেক কাণ্ডে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কবিতাকারে সাত কাণ্ডের কথা বলা যায়:

আদি কাণ্ডে রামের জন্ম, বিবাহ সীতার।
অযোধ্যাতে বনবাস ত্যাজি রাজ্যভার।
অরণ্য কাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাতে হয় সুগ্রীব মিলন।
সুন্দর কাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয়পক্ষের মহারণ।
উত্তর কাণ্ডেতে হয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ।

ছবিতে রামায়ণ

সাগর বাঁধতে এলো নীলবীর। তার হুকুমে বানরসেনারা বড়ো বড়ো গাছ ও পাথর এনে সমুদ্রের উপর ফেলতে লাগলো। তৈরি হলো সেতু।
এই সেতুর ওপর দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে রাম-লক্ষ্মণ তাঁদের অসংখ্য বানরসেনা নিয়ে লঙ্কায় এসে পৌঁছালেন।
এই দেখে রাবণের ভাই সাধু বিভীষণ সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বলায় রাবণ তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল।
সাধু বিভীষণ মনের দুঃখে পাপাত্মা রাবণের পক্ষ ছেড়ে তক্ষুনি চলে এলো রামের আশ্রমে।

ছবিতে রামায়ণ

রামের সৈন্যরা লঙ্কা অবরোধ করলে রাবণ ছাদে উঠে তাদের দেখেও যুদ্ধ বন্ধ করলো না।
রাবণকে রাগানোর জন্য একদিন যুবরাজ অঙ্গদ রাবণের সভায় এসে তাকে অপমান করে তার মাথার মুকুট কেড়ে নিয়ে পালালো।
রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করে রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্দী করলো।
বিষ্ণুর বাহন গরুড় নাগের শত্রু। হনুমান গরুড়কে ডাকলেন গরুড় ছুটে এসে নাগপাশ থেকে তাঁদের মুক্ত করে দিলো।

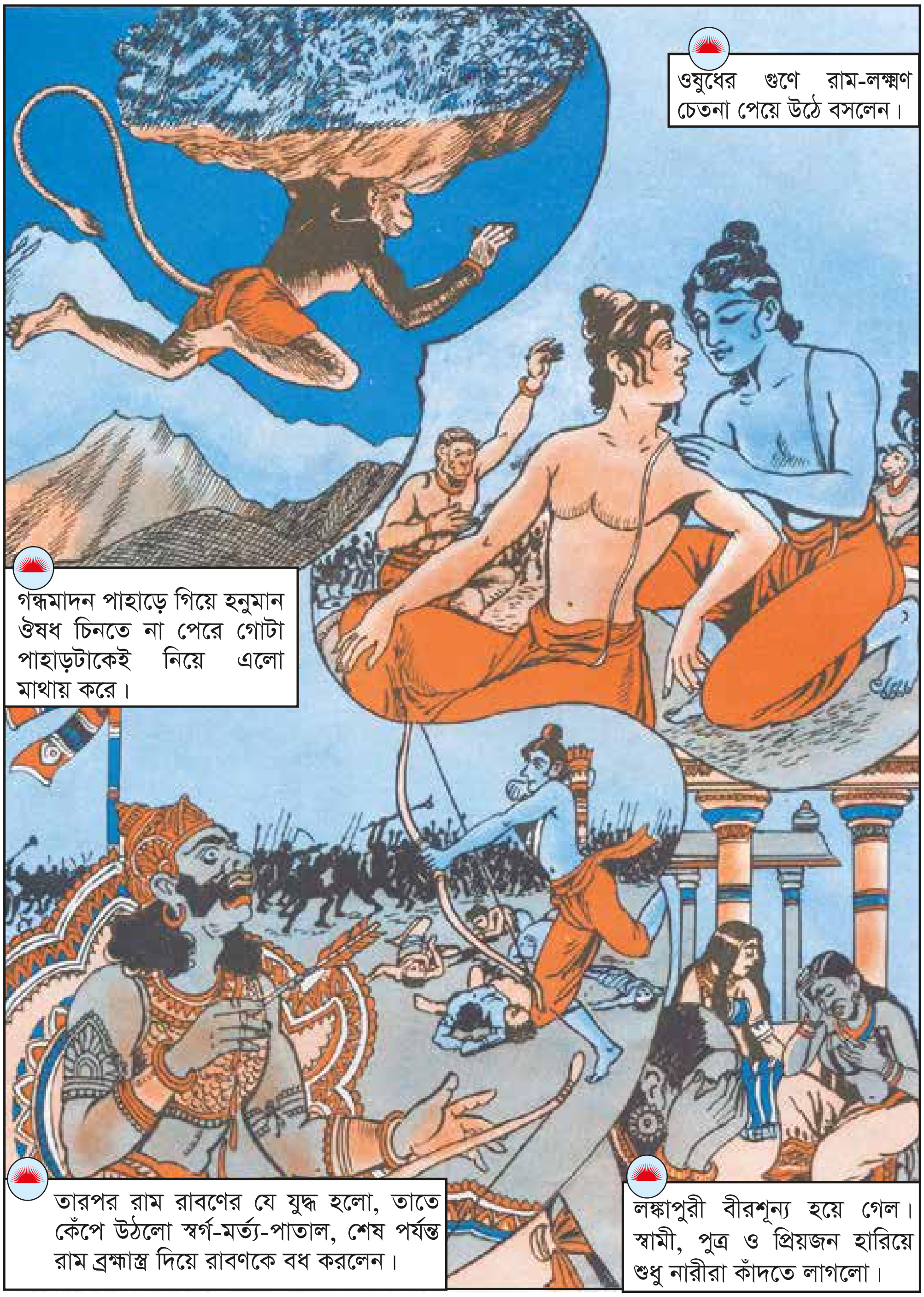
গন্ধমাদন পাহাড়ে গিয়ে হনুমান ঔষধ চিনতে না পেরে গোটা পাহাড়টাকেই নিয়ে এলো মাথায় করে।
ওষুধের গুণে রাম-লক্ষ্মণ চেতনা পেয়ে উঠে বসলেন।
তারপর রাম রাবণের যে যুদ্ধ হলো, তাতে কেঁপে উঠলো স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, শেষ পর্যন্ত রাম ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে রাবণকে বধ করলেন।
লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হয়ে গেল। স্বামী, পুত্র ও প্রিয়জন হারিয়ে শুধু নারীরা কাঁদতে লাগলো।

ছবিতে রামায়ণ

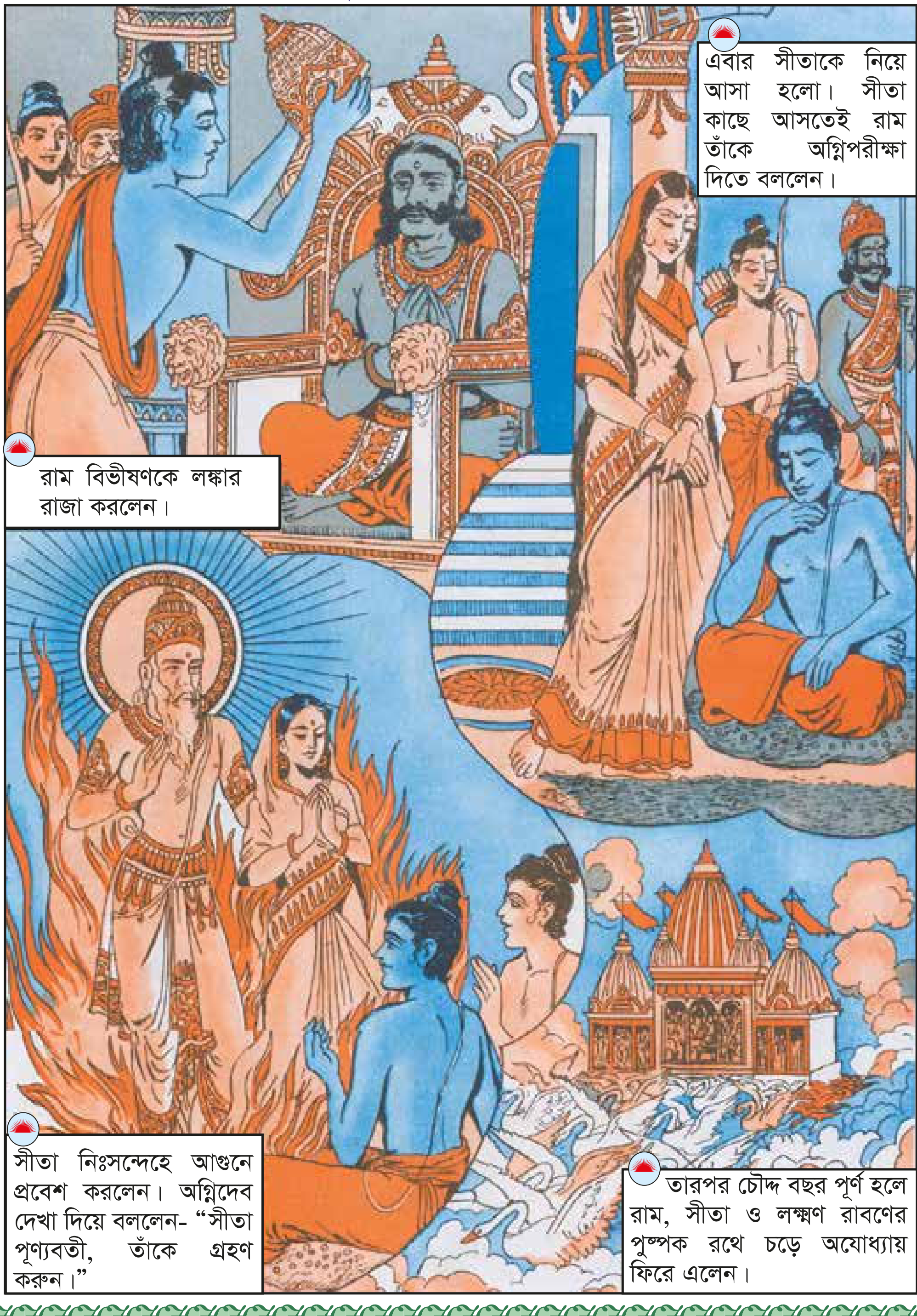

রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করলেন।
এবার সীতাকে নিয়ে আসা হলো। সীতা কাছে আসতেই রাম তাঁকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললেন।
সীতা নিঃসন্দেহে আগুনে প্রবেশ করলেন। অগ্নিদেব দেখা দিয়ে বললেন- "সীতা পূণ্যবতী, তাঁকে গ্রহণ করুন।"
তারপর চৌদ্দ বছর পূর্ণ হলে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ রাবণের পুষ্পক রথে চড়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

মহাভারতে কী আছে?

মহাভারত একটি বিশাল গ্রন্থ। মহাভারতে ১৮টি পর্ব আছে। এ পর্বগুলোতে একে একে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা আছে।

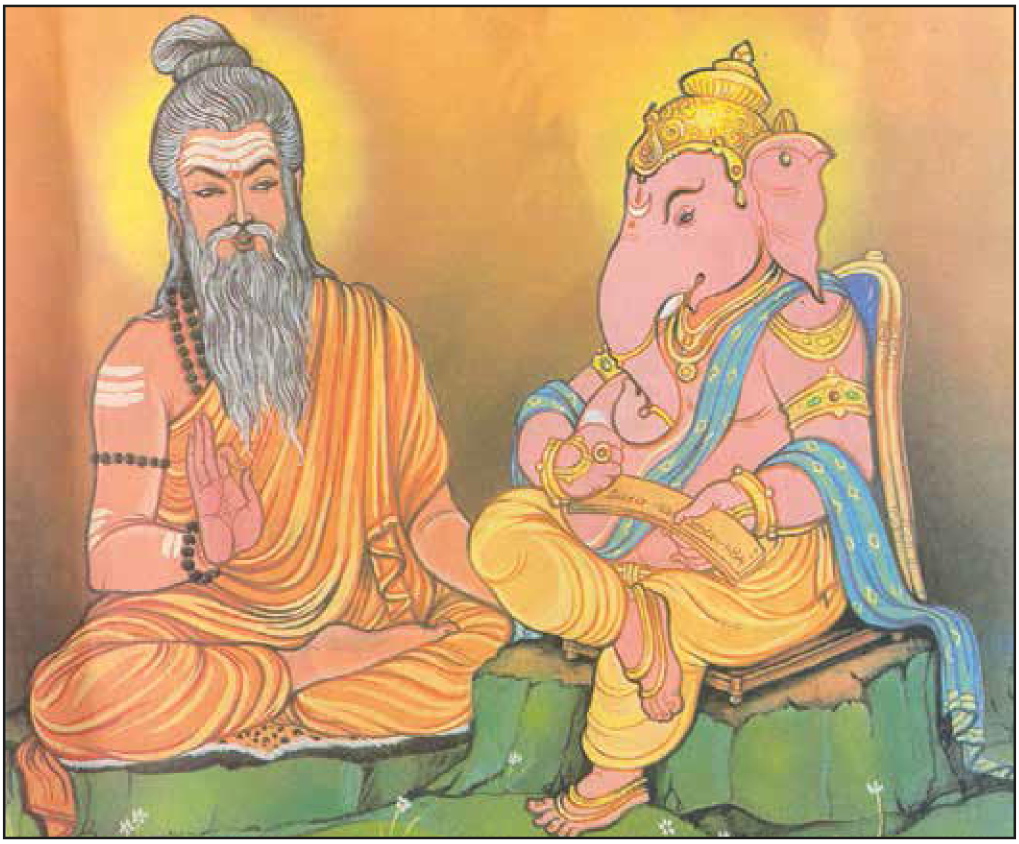

ছবিতে পরাশর মুনির পুত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাস মুখে মুখে মহাভারত বলছেন আর গণপতি গজানন গণেশ তা শর্তমতো বুঝে বুঝে লিখে চলছেন।

এ গ্রন্থটিতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা আছে। যে যুদ্ধকে ধর্ম যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধে হাজার হাজার লোক মারা যায় এবং সত্যের জয় আর মিথ্যার পরাজয় হয়।

এই গ্রন্থটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সখা অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়।

ধর্ম স্থাপনে এই যুদ্ধ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কেননা এই যুদ্ধের মাঝ দিয়েই অধার্মিকদের পরাজয় আর ধার্মিকদের জয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি

এ ছবিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রথের সারথি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সারথি অবস্থায় তিনি অর্জুনকে উপদেশ দেন, কেন যুদ্ধ করতে হবে? মূলতঃ এই যে উপদেশ বাণী এর মাধ্যমেই আমাদের সংসার জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এ বাণী বা উপদেশই পরবর্তীতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

ছবিতে মহাভারত

অনেক কাল আগে বর্তমান দিল্লির কাছে হস্তিনা নামে এক রাজ্য ছিল। রাজা শান্তনু হস্তিনায় রাজত্ব করতেন। গঙ্গাদেবী স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসে রাজা শান্তনুকে বিয়ে করেছিলেন।
শান্তনু ও গঙ্গাদেবীর দেবব্রত নামে এক পুত্র হয়। গঙ্গাদেবী দেবব্রতকে শিশু অবস্থায় শান্তনুর কাছে রেখে স্বর্গে চলে যান।
দেবব্রত শান্তনুর স্নেহে ও যত্নে বড়ো হন। অল্প বয়সেই তিনি বিভিন্ন বিদ্যা ও অস্ত্রচালনায় বিশারদ হন।
ইতোমধ্যে একদিন শান্তনু যমুনার তীরে বেড়াতে গিয়ে সত্যবতী নামে এক সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পান। সত্যবতী ছিলেন এক ধীবরের পালিতা কন্যা। শান্তনু সত্যবতীকে বিয়ে করবেন স্থির করেন।
শান্তনু একদিন ধীবরের কাছে গিয়ে মনের কথা জানান। ধীবর বললেন, মহারাজ এ বিয়েতে আমি মত দিতে পারি না। দেবব্রতের মত সোনার চাঁদ ছেলেই তো আপনার পর রাজা হবে।
ধীবর জানান, সত্যবতীর ছেলে হলে যদি দেবব্রতর বদলে রাজা হতে পারে তাহলে শান্তনু সত্যবতীকে বিয়ে করতে পারেন। এই কথা শুনে শান্তনু বিষণ্ন মনে ফিরে আসেন।

ছবিতে মহাভারত

অভিমন্যু ও উত্তরার বিয়ের পর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম, রাজা দ্রুপদ প্রভৃতি পাণ্ডবহিতৈষীগণ কী উপায়ে পাণ্ডবেরা তাঁদের রাজ্য পুনরায় ফিরে পাবেন, তার মন্ত্রণা করতে বসলেন।
পাণ্ডবদের রাজ্য পুনরায় চেয়ে কৌরব-সভায় পুরোহিত ধৌম্যকে দূতরূপে পাঠানো হলো, কিন্তু দুর্যোধন বললেন, "বিনাযুদ্ধে আমি কিছুই পাণ্ডবদের দেব না।"
মহামতি বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ সকলেই দুর্যোধনকে অনেক রকমে যুদ্ধের কুফল বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্যোধনের এক কথা যুদ্ধ-যুদ্ধ আর যুদ্ধ।
যখন দেখা গেল, যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই, তখন পাণ্ডবেরা ভারত বর্ষের সমস্ত রাজার কাছে তাঁদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য দূত পাঠালেন। দুর্যোধনও বসে ছিলেন না, তাঁর পক্ষ থেকেও রাজাদের কাছে দূত গেল।
শ্রীকৃষ্ণকে নিজ দলে পাবার জন্য দুর্যোধন ও অর্জুন দুজনেই দ্বারাকায় গেলেন। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর মাথার কাছে একখানি সিংহাসনে দুর্যোধন বসলেন, আর অর্জুন বসলেন তাঁর পায়ের কাছে।
ঘুম থেকে উঠে তিনি প্রথমেই অর্জুনকে দেখলেন, তাই তিনি যোগ দিলেন পাণ্ডব পক্ষে। দুর্যোধনকেও তিনি নিরাশ করলেন না, তাকে দিলেন তাঁর দুদ্ধর্ষ নারায়ণী সেনাবাহিনী।

ছবিতে মহাভারত

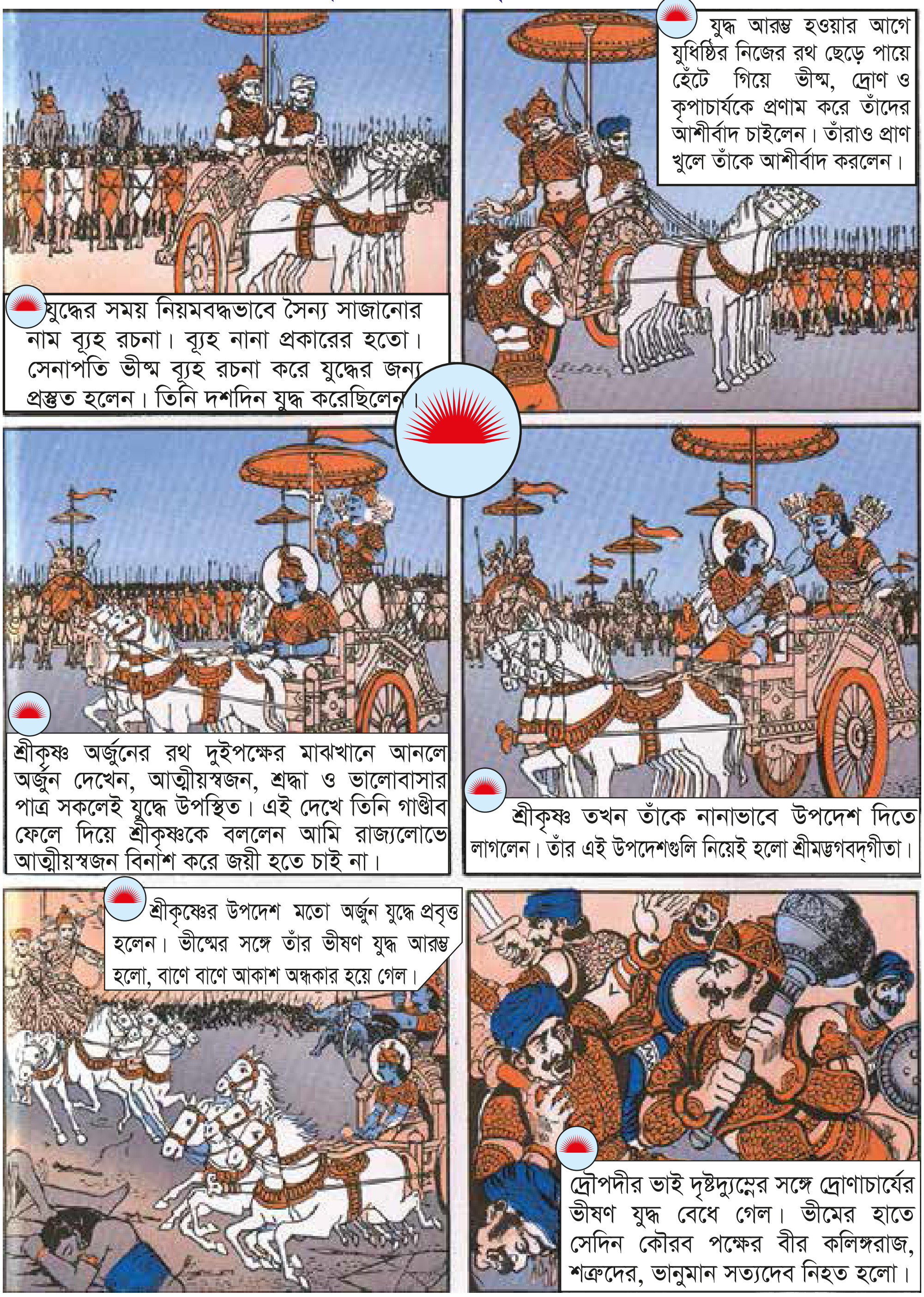
যুদ্ধের সময় নিয়মবদ্ধভাবে সৈন্য সাজানোর নাম ব্যূহ রচনা। ব্যূহ নানা প্রকারের হতো। সেনাপতি ভীষ্ম ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি দশদিন যুদ্ধ করেছিলেন।
যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে যুধিষ্ঠির নিজের রথ ছেড়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ চাইলেন। তাঁরাও প্রাণ খুলে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ দুইপক্ষের মাঝখানে আনলে অর্জুন দেখেন, আত্মীয়স্বজন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র সকলেই যুদ্ধে উপস্থিত। এই দেখে তিনি গাণ্ডীব ফেলে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন আমি রাজ্যলোভে আত্মীয়স্বজন বিনাশ করে জয়ী হতে চাই না।
শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে নানাভাবে উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর এই উপদেশগুলি নিয়েই হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মতো অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো, বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল।
দ্রৌপদীর ভাই দৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। ভীমের হাতে সেদিন কৌরব পক্ষের বীর কলিঙ্গরাজ, শক্রদেব, ভানুমান সত্যদেব নিহত হলো।

ছবিতে মহাভারত

এদিকে কৃষ্ণসহ পাণ্ডবেরা গুপ্তচর মুখে দুর্যোধনের সংবাদ পেয়ে হ্রদের তীরে গিয়ে বললেন "কী হে দুর্যোধন, তুমি সকলকে যমের হাতে সঁপে দিয়ে প্রাণভয়ে এখানে লুকিয়ে আছ? সাহস থাকে তো বেরিয়ে এসে যুদ্ধ কর।"
অভিমানী দুর্যোধন তাঁদের কঠিন কথায় অস্থির হয়ে এসে ভীমের সঙ্গে গদা-যুদ্ধ করতে চাইলেন। এমন সময় ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের গুরু বলরাম সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কুরুক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতে বললেন।
তারপর কুরুক্ষেত্রে এসে ভীম ও দুর্যোধনের ভীষণ গদাযুদ্ধ শুরু হলো। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ভীম গদাঘাতে দুর্যোধনের দুই উরু ভেঙ্গে ফেললেন। এই ভাবে রাজা দুর্যোধন ধরাশায়ী হলেন। বিজয়ী পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের কথায় সে রাত্রিতে শিবিরে না গিয়ে যমুনার তীরে শুয়ে রইলেন।
পাণ্ডবেরা চলে যেতে রাত্রের অন্ধকারে গা ঢেকে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃত-বর্ম্মা আবার দুর্যোধনের কাছে এসে তাঁর অবস্থা দেখে কেঁদে আকুল হলেন।
অশ্বত্থামা বললেন-"মহারাজ, আপনার অবস্থা দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আজ রাত্রেই পাণ্ডবদের বিনাশ করবো।"
মৃত্যু পথযাত্রী দুর্যোধন, অতি কষ্টে হাতের উপর ভর দিয়ে একটু উঠে অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে বরণ করলেন। তাঁরা পাণ্ডব শিবিরের দিকে রওনা হলেন।

ছবিতে মহাভারত

নকুল ও সহদেবের মামা মদ্ররাজ শল্য কৌরব-পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে অভিমন্যুর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। মামা যোদ্ধা রাক্ষস আলম্বুষ সাত্যকির কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।
দুর্যোধন বহু সৈন্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে ফেললেন দেখে অর্জুন তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলেন। এখন তাঁর তেজ সহ্য করতে না পেয়ে কৌরবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগলো। ভীমের হাতে সেদিন দুর্যোধনের চৌদ্দটি ভাই প্রাণ দিল।
সৈন্যদের পরাজয়ে দুর্যোধন রেগে গিয়ে ভীষ্মকে বললেন "দাদামশাই আপনি একটু মন দিয়ে যুদ্ধ করুন, না হলে পাণ্ডবেরা যে দুদিনেই আমাদের বিনাশ করে ফেলবে।" ভীষ্ম বললেন-"কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবদের পরাস্ত করা অসম্ভব।"
পরদিন ভীষ্ম এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে কার সাধ্য তাঁর সামনে দাঁড়ায়। অর্জুন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একটা রথের চাকা নিয়ে ভীষ্মকে বধ করতে ছুটে চললেন। অর্জুন তাঁকে ধরে ফেলে বললেন- "আপনি না এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন।"
দ্রুপদের এক সন্তান শিখণ্ডী ছিল নপুংসক। ভীষ্ম তাকে দেখলে যুদ্ধ করতেন না। একথা জেনে অর্জুন শিখণ্ডীকে তাঁর রথের সামনে বসিয়ে পিছন থেকে বাণ মেরে ভীষ্মকে জর্জ্জরিত করে ফেললেন।
দশ দিন যুদ্ধের পর এইভাবে বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্ম রথ হতে পড়ে গেলেন। তাঁর দেহ মাটি স্পর্শ করল না, বাণের উপরেই রয়ে গেল। তিনি কুরু-পাণ্ডবদের ডেকে যুদ্ধ বন্ধ করতে উপদেশ দিলেন। দুর্যোধন তাঁর কথা শুনলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের একধারে চাঁদোয়া খাটিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে ভীষ্ম শরশয্যায় পড়ে রইলেন। তাঁর ছিল ইচ্ছামৃত্যু।

ছবিতে মহাভারত

দুর্যোধনের নিকট হতে বিদায় নিয়ে তিনজন একটা বটগাছের নিচে এসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ঘুমিয়ে পড়লেন। দুঃখ ও চিন্তায় অশ্বথামার ঘুম এলো না। গভীর রাত, গাছের ডালে কতকগুলো কাক তাদের বাসায় ঘুমে অচেতন; এমন সময় একটা পেঁচা এসে সেই ঘুমন্ত কাকগুলিকে বধ করতে লাগলো। এই দেখে অশ্বথামার মনে হলো- ‘তাইতো, আমিও তো এভাবে শত্রুদের বধ করতে পারি।’
তিনি কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে জাগিয়ে মনের কথা বললেন; তাঁরা ঘৃণা ও লজ্জায় এতে ঘোর আপত্তি করলেন, কিন্তু শেষে তাঁর পীড়াপীড়িতে রাজী হয়ে অন্ধকারে চোরের মতো পাণ্ডব-শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।
কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে দ্বারে রেখে খড়গ হাতে অশ্বথামা শিবিরে ঢুকে পিতৃহন্তা দৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচটি ছেলে ও অন্যান্য বীরগণকে পশুর মতো হত্যা করলেন।
পরদিন সেই বীভৎস হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন রথে চড়ে অশ্বথামার সন্ধানে বের হয়ে বহুদূরে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন। তখন নিরুপায় অশ্বথামা ব্রহ্মশির’ নামে ভীষণ অস্ত্র পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য ছুঁড়ে মারলেন।
কৃষ্ণের উপদেশ মতো অর্জুন ও এক মহা দিব্যাস্ত্র ছুঁড়লেন। দুই অস্ত্রের প্রভাবে পৃথিবী রসাতলে যেতে বসলো। তখন দেবতারা উপস্থিত হয়ে দুজনকে অস্ত্র সংবরণ করতে উপদেশ দিলেন।
অশ্বথমার মাথায় একটি মণি ছিল। দেবতারা মধ্যস্থ হয়ে সেই মণিটি পাণ্ডবদের দিয়ে দিতে বললেন। তাতে অশ্বথামার সব তেজ ও শৌর্য নষ্ট হয়ে গেল। তারপর অশ্বথামা কোথায় গেলেন কেউ তা জানে না।

ছবিতে মহাভারত

শ্রীকৃষ্ণের অভাবে যুধিষ্ঠির মনোদুঃখে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে সিংহাসনে বসিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। চার ভাই ও দ্রৌপদী চললেন তার সঙ্গে। হস্তিনার লোক বহুদূর পর্যন্ত সজলচক্ষে তাঁদের অনুগমন করে ফিরে এলো। কিন্তু একটি কুকুর তাঁদের সঙ্গ ছাড়লো না।
ক্রমে পাণ্ডবেরা হিমালয়ের অতি দুর্গম স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। পথশ্রমে ও শীতে প্রথমে দ্রৌপদী, তার পর নকুল, সহদেব, অর্জুন ও ভীম একে একে প্রাণ হারিয়ে পড়ে রইলেন।
যুধিষ্ঠির তাঁদের দিকে ফিরেও চাইলেন না, মহাপ্রস্থানের যাত্রীকে ফিরে তাকাতে নেই।
এসময়ে দেবরাজ ইন্দ্র রথ নিয়ে যুধিষ্ঠির সম্মুখে উপস্থিত হলেন। বললেন ‘দ্রৌপদী ও তোমার ভাইয়েরা আগেই স্বর্গে গিয়েছেন। এবার তুমি চলো, তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য রথ নিয়ে এসেছি।” কিন্তু সঙ্গী কুকুরকে ছেড়ে যুধিষ্ঠির কোনমতেই স্বর্গে যেতে রাজী হলেন না।
ভগবানের নাম জপ করতে করতে তিনি চলতে লাগলেন। কুকুরটি তাঁর সঙ্গে চললো।
তখন যুধিষ্ঠির মন্দাকিনীতে স্নান করে, স্বর্গে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও সকল আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরামানন্দে কাল কাটাতে লাগলেন।

দৈনন্দিন নিত্যকর্ম ও আচার পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মন্ত্র

ক্রমিক	দৈনন্দিন নিত্যকর্ম ও আচার		মন্ত্রসমূহ
১	সকল কাজ শুরু করার আগে বলতে হয়	:	ওঁ তৎ সৎ।
২	বাড়ি থেকে রওয়ানা দেওয়ার আগে বলতে হয়		ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোহস্তুতে। বা ‘দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা’।। সরলার্থ: হে সর্বমঙ্গলদায়িনী, কল্যাণময়ী, সর্বার্থপ্রদানকারিণী, আশ্রয়- স্বরূপিণী, ত্রিনয়না, হে গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
৩	রাতে ঘুমানোর সময়		ওঁ শ্রী পদ্মনাভায় নমো নমঃ।
৪	খাদ্য গ্রহণমন্ত্র		ওঁ শ্রী জনার্দ্দনায় নমঃ।
৫	জন্মসংবাদ		কারো জন্ম সংবাদ শুনলে ৩ (তিন) বার বলতে হয় : ওঁ আয়ুষ্মান্ ভব।।
৬	দুঃসংবাদ		কারো দুঃসংবাদ শুনার সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়: ওঁ আপদং অপবাদশ্চ অপসরঃ।।
৭	মৃত্যু সংবাদ		দিব্যান, লোকান সঃ গচ্ছতুঃ।।
৮	গুরু প্রণাম		ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। সরলার্থ: যিনি অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন (অজ্ঞানরূপ তিমির রোগের দ্বারা অন্ধ) শিষ্যের চক্ষু জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দিয়ে উন্মীলিত করেন, সে গুরুদেবকে প্রণাম।
৯	বই পড়ার আগে		ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে, বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।। সরলার্থ: হে মহাভাগ সরস্বতী, বিদ্যাদেবী, কমলনয়না, বিশ্বরূপা, বিশালাক্ষী আমাকে বিদ্যা দাও। তোমাকে নমস্কার।
১০	বিপদকালে বলতে হয়		ওঁ মধুসূদনায় নমঃ! ওঁ মধুসূদনায় নমঃ! ওঁ মধুসূদনায় নমঃ!
১১	কোন কারণে ভীত হলে বলতে হয়		রাম! রাম! রাম! অথবা ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু।
১২	যানবাহনে আরোহনকালে বলতে হয়		ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ!
১৩	ঔষধ সেবনকালে বলতে হয়		ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু!
১৪	মৃত্যুকালে বলতে হয়		ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ!
১৫	অগ্নি ভয়ে বা আগুনের ভয়ের সময় বলতে হয়		ওঁ জলশায়িনম্! ওঁ জলশায়িনম্! ওঁ জলশায়িনম্!
১৬	কোন ব্যক্তির সাথে দেখা হলে বলতে হয়		দুই হাত জোড় করে বুকের কাছে হাত নিয়ে এসে “নমস্কার”।
১৭	সর্ব কার্যের শেষে বলতে হয়		ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

–শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

"ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব।"

-শ্রী রামকৃষ্ণ

"নিজের প্রার্থনা নিজেই করতে হয়।"

-প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর

"সর্বদা নাম করবে, নামই মনকে স্থির করে দিবে।"

-শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

"কদাচ পিতা-মাতার অবাধ্য হইও না।"

-ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিক্ষাবর্ষ-২০২৬

ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ি হরিমন্দির, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীভগবান্ উবাচ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮/৬৬

সরলার্থ : ভগবান বলিলেনঃ সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না॥ ১৮/৬৬

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক
প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য